ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

ICDDR,B
CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৯ সংখ্যা ৩ চৈত্র ১৪০৭

কমিউনিটি গ্রুপ

বাংলাদেশের গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

সুকুমার সরকার, জিয়াউল ইসলাম, হোসনে আরা বেগম
এস এম আসিব নাসিম, মোঃ মেসবাহউদ্দীন

পৃথিবীর প্রায় সব দেশ ১৯৭৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে কাজাকিস্তানের আলমা আতা শহরে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে উপযুক্ত উপায় বলে ঘোষণা দিয়ে জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের এক যুগান্তকারী অঙ্গীকার গ্রহণ করে। 'আলমা আতা ঘোষণা' নামে পরিচিত এই অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষরদানকারী সকল দেশ আশির দশকের শুরু থেকে নিজ নিজ ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিসরে নিজেদের প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জনগণের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে থাকে। জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্য উন্নয়নের এই আন্দোলন পৃথিবীব্যাপী উল্লেখ্যযোগ্য সফলতা লাভ করে। অবশ্য দেশে দেশে এই সাফল্যের মাত্রার ভিন্নতা রয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা জনসাধারণকে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

কোনো জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য সেবা-ব্যবস্থায় জনগণের সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের অংশগ্রহণের এই অভিজ্ঞতা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় জনসাধারণ কিভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে কিংবা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিয়ে দেশে দেশে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এসব গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের রূপ বা ধরন দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার কাঠামোর ওপর নির্ভর করে। ফলে বিভিন্ন দেশে তা বিভিন্ন রকম হতে পারে। এমনকি একই দেশে তা সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ভিন্নরূপ লাভ করতে পারে। এমনি এক সংস্কারমূলক বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমাদের দেশে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যাবশ্যক সেবা প্যাকেজ চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে, সেখানে জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণে নানাবিধ সমস্যা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়, যেমন অস্বাভাবিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর উচ্চ হার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ, মহামারী, ইত্যাদি। এসব সমস্যা জাতীয় উন্নয়নে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। এরকম অবস্থায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক এককভাবে উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং তাকে স্থায়ী রূপ দান করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি জনগণকেও ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এ-কাজে সরকারকে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং সরকারের উদ্যোগের অংশীদার হতে হবে। জনগণের অংশগ্রহণের ধরন যাই হোক না কেনো, এটা আজ অনস্বীকার্য যে, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে স্বাস্থ্য উন্নয়নের টেকসই ধারা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি থেকে দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায়, বিশেষ করে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায়, জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য এ-যাবৎ বিভিন্ন রকম সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং তাতে বেশ কিছু সাফল্যও অর্জিত হয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণ সাধারণত যেকোনো উন্নয়নমূলক উদ্যোগে বা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অতীতে দেখা গেছে যে, গ্রামের বিত্তবান ব্যক্তিরা নিজ তহবিল ও উদ্যোগে তাঁদের

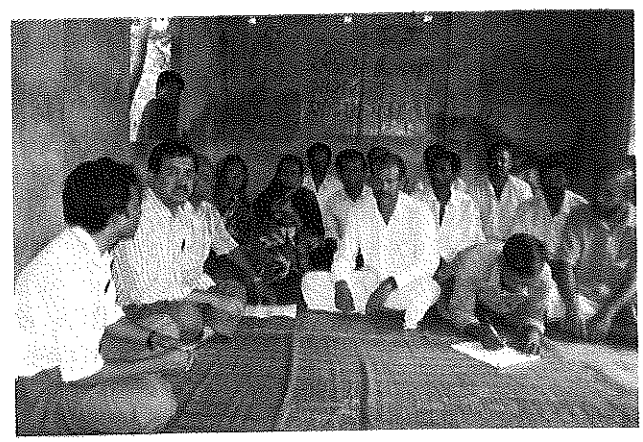

চলিশিয়া কমিউনিটি গ্রুপের কয়েকজন সদস্য

গর্ভবতী মহিলা এবং হেপাটাইটিস

গর্ভাবস্থায় শেষের তিন মাসে যদি কোনো মহিলা হেপাটাইটিস B ভাইরাসে আক্রান্ত হয়, তবে গর্ভের বাচ্চারও শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষেত্রে হেপাটাইটিসে ভোগার সম্ভাবনা থাকে। এসব মায়ের মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে এবং এসব বাচ্চাদের হেপাটাইটিস B ভাইরাসের দীর্ঘস্থায়ী বাহক হবার সম্ভাবনাও বেশি থাকে। হেপাটাইটিস B ছাড়াও E ভাইরাস দ্বারা যেসব গর্ভবতী মহিলা আক্রান্ত হয় তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি শতকরা ১০-২০ ভাগ।

রোগ নির্ণয়

সেরাম বিলিরুবিনের মাত্রা থেকে রোগের তীব্রতা বোঝা যায়। রক্তে এর স্বাভাবিক মাত্রা ০.২ - ০.৮ মিলিগ্রাম/১০০ মি.লি.। ১ মি.গ্রা/১০০ মি.লি. থেকে ৩ মি.গ্রা/১০০ পর্যন্ত সুপ্ত জন্ডিস এবং ৩ মি.গ্রা/১০০ মি.লি.-এর বেশি হলে দৃশ্যমান জন্ডিস হয়। হেপাটাইটিস বি-এর উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য HBsAg (ELISA Method) পরীক্ষা করা উচিত। HBsAg ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার ১ মাস পর থেকে সাড়ে ৪ মাস পর্যন্ত পজিটিভ পাওয়া যায়। Chronic Hepatitis B ভাইরাস ইনফেকশনে HBsAg ও AntiHBc (IgG) পজিটিভ পাওয়া যায়। HBsAg পজিটিভ হলে ভাইরাসের বংশ বিস্তার লিভারে হচ্ছে বোঝা যায়—যা থেকে লিভার সিরোসিস অথবা যকৃতের ক্যান্সার হতে পারে। রক্তে আলফা-ফিটো প্রোটিনের উচ্চমাত্রা লিভার ক্যান্সার-এ পাওয়া যায়। তবে লিভার Biopsy দ্বারা লিভার ক্যান্সার ও লিভার সিরোসিস নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায়। এছাড়াও, আরো অনেক পরীক্ষা আছে যেগুলো সাধারণত হাসপাতালে-ভর্তি রোগীদের উন্নতি-অবনতির পরিমাপক।

চিকিৎসা

ভাইরাল হেপাটাইটিস-এর নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। রোগীকে বিশ্রাম নিতে হবে। স্বাভাবিক হাঁটাচলা করতে পারবে, তবে কোনো ধরনের কঠিন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। রোগী স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে। খাদ্য গ্রহণ তার রুচির ওপর ছেড়ে দেওয়া ভালো, তবে আমিষযুক্ত খাবার খেতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। যেসব রোগী মুখে কিছুই খেতে পারে না, ঘন ঘন বমি করে, যাদের জন্ডিসের মাত্রা দ্রুত বাড়তে থাকে, সেসব রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করাই ভালো।

এ-রোগে কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই। বেশির ভাগ ওষুধের বিপাক ক্রিয়া লিভারে ঘটে থাকে। বেশিরভাগ ওষুধ রোগের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। তাই ওষুধ খাওয়ার আগে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। এই রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসার বদলে কিছু অপচিকিৎসা হয়ে থাকে—যার ফলে কখনো কখনো রোগীর জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ে, যেমন অপ্রয়োজনে শিরায় স্যালাইন দেওয়া, ভিটামিনমিশ্রিত স্যালাইন, ২৫% গ্লুকোজমিশ্রিত স্যালাইন, স্টেরয়েড ইনজেকশন দেওয়া, ডায়াজিপাম ও অন্যান্য ঘুমের ওষুধ, বমি বন্ধের ওষুধ, ইত্যাদি খাওয়ানো। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। অনেকের ধারণা, তেল, মশলা, হলুদ ছাড়া তৈরি খাদ্য রোগীর পথ্য। অনেকে মাছ, মাংস, ডিম পরিহার করে থাকে—যা সঠিক নয়। রান্নায় ব্যবহৃত হলুদের সাথে জন্ডিসের কোনো সম্পর্ক নেই।

হেপাটাইটিস রোগের প্রতিরোধ এবং প্রতিষেধক

এই রোগের বিস্তার রোধে নিম্নোক্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রয়োজন:

হেপাটাইটিস A: হেপাটাইটিস A থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রধান উপায় হলো স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, হোটেলের খাবার ও বাজারের খোলা খাবার বর্জন করা, বিশুদ্ধ পানি পান করা। হেপাটাইটিস A ভ্যাকসিন বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে। এই ভ্যাকসিন শুধুমাত্র ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় ভ্রমণকারীদের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

হেপাটাইটিস B: এক্ষেত্রে ঝুঁকির কারণসমূহ এড়িয়ে চলতে হবে, যেমন:

- ❑ যৌনসঙ্গী হেপাটাইটিস B ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহ হলে যেকোনো ধরনের যৌনমিলন পরিহার করা। যৌনমিলন পরিহার করা সম্ভব না হলে কনডম ব্যবহার করা।
- ❑ হেপাটাইটিস B ভাইরাসের পরীক্ষা ছাড়া রক্ত-সঞ্চালন না-করা
- ❑ হেপাটাইটিস B ভাইরাসের পরীক্ষা ছাড়া রক্তের তৈরি চিকিৎসা সামগ্রী ব্যবহার না-করা
- ❑ ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ও সুঁচ ব্যবহার না-করা
- ❑ যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত না হলে অপারেশনে ব্যবহার না-করা

হেপাটাইটিস B রোগের প্রতিষেধক হেপাটাইটিস B ভ্যাকসিন এখন সর্বত্রই পাওয়া যাচ্ছে। সরকারের টিকাদান কর্মসূচিতে এই ভ্যাকসিন এখনও অন্তর্ভূক্ত হয় নি এবং সবার জন্য সুপারিশ করা হয় নি। শুধু যারা প্রতিনিয়ত হেপাটাইটিস B ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মুখে তাদের হেপাটাইটিস B ভ্যাকসিন নেওয়া আবশ্যক। যারা ঝুঁকিপূর্ণ তাদের একটি তালিকা সারণীতে দেখানো হলো:

হেপাটাইটিস B ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার পূর্বে	হেপাটাইটিস B ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার পর
স্বাস্থ্যসেবাসংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ (ডাক্তার, নার্স, ল্যাব-টেকনিশিয়ান)	দূর্ঘটনাক্রমে শরীরে হেপাটাইটিস B ভাইরাস ঢুকে পড়লে (যেমন রক্ত-সঞ্চালনের প্রক্রিয়ায়)
সমকামী, বহুগামী	HBsAg-পজিটিভ মায়ের শিশু
হিমোডায়ালায়সিসের রোগী, নিয়মিত রক্ত বা রক্তসামগ্রী থেকে তৈরি উপাদান গ্রহণকারী রোগী	আক্রান্ত ব্যক্তি ও ভাইরাস বাহকের সাথে যৌনমিলনের পর
ড্রাগ আসক্ত	
পর্যটক	

নিচের সারণীতে বর্ণিত মাত্রায় ভ্যাকসিন দিতে হবে:

যাদেরকে দিতে হবে	ডোজের পরিমাণ	ডোজের সিডিউল
নবজাতক - মায়ের যদি HBsAg-পজিটিভ হয়	১০ মাইক্রোগ্রাম	জন্মের সাথে সাথে (০), ১ মাস, ৬ মাস
নবজাতক - মায়ের যদি HBsAg-নেগেটিভ হয়	১০ মাইক্রোগ্রাম	১ মাস, ৪ মাস, ৬ থেকে ১৮ মাস
১১ বৎসরের কম-বয়সের শিশু	১০ মাইক্রোগ্রাম	০, ১, ৬ মাস
১১ বৎসরের বেশি বয়সের কিশোর-কিশোরী এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি	২০ মাইক্রোগ্রাম	০, ১, ৬ মাস

হেপাটাইটিস C: রক্ত-সঞ্চালনের পূর্বে তা পরিশোধিত কি না পরীক্ষা করে দেওয়া আবশ্যক। এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোনো ভ্যাকসিন আবিস্কার হয় নি।

হেপাটাইটিস D: হেপাটাইটিস B প্রতিরোধের মাধ্যমে এই ভাইরাস প্রতিরোধ করা যায়।

হেপাটাইটিস E: হেপাটাইটিস E থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় হলো বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা।

পৃথিবী জুড়েই এখন হেপাটাইটিস একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা, তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ-সমস্যা প্রকট। যেহেতু রোগের তেমন কোনো চিকিৎসা নেই, জনগণের স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ-রোগের প্রতিকার করা উত্তম।

কলেরা হাসপাতাল পরিচালনার স্থায়ী তহবিল

নতুন আয়ের উৎস সন্ধান

সংলাপ প্রতিবেদন

আইসিডিডিআর,বি'র পরিচালনাধীন ঢাকা ও মতলবে অবস্থিত কলেরা হাসপাতালে বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। এসব রোগীর অধিকাংশই পাঁচ বছরের কম-বয়সের শিশু যারা ডায়রিয়া, আমাশয়, নিউমোনিয়া ও এতদসংক্রান্ত জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে এখানে চিকিৎসার জন্য আসে। এদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য যে বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ হয়, দীর্ঘকাল ধরে তার জোগান দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন দাতাসংস্থা থেকে প্রাপ্ত অনুদান থেকে। এক পর্যায়ে যখন এধরনের অনুদান পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন ১৯৯১ সালে 'হাসপাতাল এন্ডাওমেন্ট ফান্ড' নামে একটি তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই তহবিল 'স্থায়ী' এই অর্থে যে, ব্যাংকে রক্ষিত টাকার মূলধন খরচ করা হবে না; সুদ হিসেবে যে টাকা পাওয়া যাবে কেবল তা-ই খরচ করা হবে।

২০০০ সাল নাগাদ এই তহবিলে ১০ মিলিয়ন ডলার সঞ্চয়ের লক্ষ্য সামনে রেখে বিভিন্ন সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রথম বড় ধরনের অনুদান আসে একজন বাংলাদেশী দাতা সুলতান আহমেদ চৌধুরীর কাছ থেকে। তিনি ১৯৯১ সালে ৫,০০০ ডলার এই তহবিলে দান করেন। এরপর ১৯৯৫ সালে সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি) ৩ মিলিয়ন ডলার দান করার পর লক্ষ্য অর্জনে আশার সঞ্চার হয়। এসডিসি'র এই ৩ মিলিয়ন ডলারের অনুদানই এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচেয়ে বড় ধরনের অনুদান। ২০০০ সালে জাপান সরকার এক মিলিয়ন ডলার এই তহবিলে দান করেছে। অন্য যেসব প্রতিষ্ঠান এই তহবিলে বড় ধরনের অনুদান দিয়েছে তাদের মধ্যে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক, রন-পোলেঙ্ক রোরার এবং স্কবি এন্ড ম্যাকিনন ট্রাস্ট উল্লেখযোগ্য। হাসপাতালের রোগীদের আত্মীয়-স্বজনও তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

নতুন আয়ের উৎস সন্ধানে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। লটারিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের টিকিট এবং বিনামূল্যে সংগৃহীত শিল্পকর্মের বিক্রয়লব্ধ টাকা এই তহবিলকে সমৃদ্ধ করছে। এসব প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২০০০ সালের শেষ নাগাদ নির্ধারিত অঙ্কের অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্য অর্জিত না হলেও ৫.৬ মিলিয়ন ডলার জমা হয়েছে। এ-বছর অর্থ সংগ্রহের কৌশল হিসেবে কিছু নতুন কার্যক্রম যুক্ত হয়েছে। এসব নতুন কার্যক্রমের একটি হলো: আইসিডিডিআর,বি'র মনোগ্রামমুদ্রিত ব্যাগ, বেসবল ক্যাপ ও টাই বিক্রয়ের ব্যবস্থা। ইতোমধ্যে কেন্দ্রের বহু কর্মকর্তা-কর্মচারী, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, দেশি-বিদেশি পর্যটক এবং নানা কার্য-উপলক্ষে যেসব ব্যক্তি এ-কেন্দ্রে আসেন তাঁদের অনেকেই এসব ব্যাগ, বেসবল ক্যাপ ও টাই কিনে হাসপাতাল তহবিলকে সমৃদ্ধ করছেন। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত 'মতলব: উইমেন, চিলড্রেন এন্ড হেল্‌থ' নামের একটি বড় আকারের বই বিক্রয়ের টাকাও সরাসরি হাসপাতালের স্থায়ী তহবিলে জমা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যে যাঁরা এই তহবিলে দান করছেন তাঁরা আয়কর মওকুফের সুবিধা পাচ্ছেন। বাংলাদেশী দাতাদের অনুদান বৃদ্ধির জন্য সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। আসুন, বিদেশি সাহায্যের দিকে তাকিয়ে না থেকে আমরা আমাদের সাধ্যমত এই তহবিলে দান করি এবং মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করি।

কলেরা হাসপাতাল একাধারে একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। উন্নত চিকিৎসাসেবার কারণে অজস্র মুমূর্ষু রোগী এখানে জীবন ফিরে পায়। আইসিডিডিআর,বি'র হাসপাতাল এন্ডাওমেন্ট ফান্ড-এ দান করে আমরা সবাই হতে পারি এই সেবার গর্বিত অংশীদার।

কমিউনিটি গ্রুপ

(২-এর পাতার পর)

ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এবং মাঠ-পর্যায়ের স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীর সঙ্গে আলোচনাক্রমে সমাজসেবায় আগ্রহী এলাকার বিভিন্ন অংশের এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে প্রতিটি ক্লিনিকের জন্য একটি করে কমিউনিটি গ্রুপ গঠন করবেন এবং পদাধিকারবলে তিনিই হবেন এই গ্রুপের পৃষ্ঠপোষণকারী ও তত্ত্বাবধায়ক। নিচের চিত্রে কমিউনিটি গ্রুপ গঠনের পদ্ধতি দেখানো হলো:

কমিউনিটি গ্রুপ গঠনের পদ্ধতি

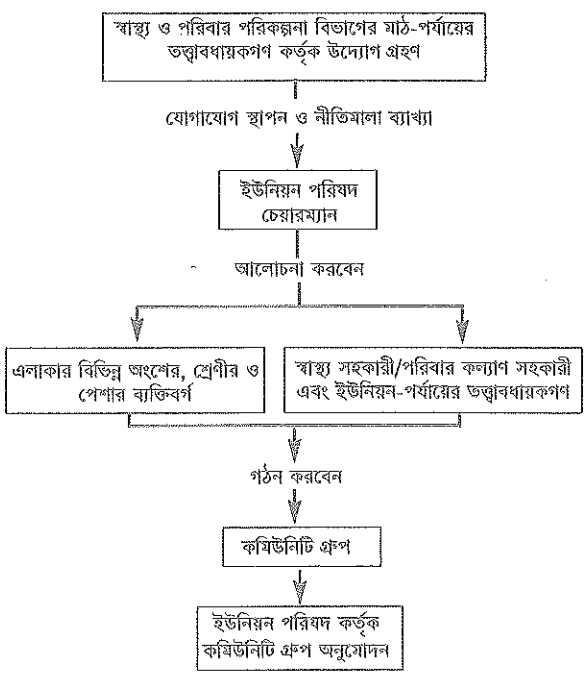

প্রস্তাবিত এই কমিউনিটি গ্রুপ ৯ থেকে ১১ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে যাঁদের মধ্যে নূন্যতম ৩ জন মহিলা সদস্য থাকবেন। সদস্যগণ যাতে কোনো বিশেষ এলাকার বাসিন্দা না হয়ে প্রকৃতভাবে সমগ্র এলাকার প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এ-বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া এই কমিটিতে এলাকার মহিলা, দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নআয়সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিও বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে। নিচে কমিউনিটি গ্রুপের সদস্য নির্বাচনের নীতিমালা বর্ণিত হলো:

কমিউনিটি গ্রুপের সদস্য নির্বাচনের নীতিমালা

- কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতাভুক্ত এলাকায় বসবাসকারী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্যগণ (বর্তমান পরিষদের নির্বাচিত সদস্য) পদাধিকারবলে কমিউনিটি গ্রুপের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত থাকবেন। সাধারণভাবে একজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য একটি কমিউনিটি গ্রুপের সদস্য থাকতে পারবেন। তবে কোনো ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ৪টির বেশি হলে একজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য সর্বোচ্চ ২টি কমিউনিটি গ্রুপের সদস্য থাকতে পারবেন।
- এলাকায় বসবাসকারী ন্যুনতম ৩ জন মহিলা এই গ্রুপের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন। ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য যদি

সংশ্লিষ্ট ক্লিনিকের আওতাভুক্ত এলাকার বাসিন্দা হন, তবে তিনি অবশ্যই পদাধিকারবলে এই গ্রুপের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

- জমিদাতা কিংবা তাঁর একজন প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন।
- সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন অভিজ্ঞ ও সমাজসেবায় আগ্রহী শিক্ষক বা স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে ২ জনকে গ্রুপের সদস্য করতে হবে। এদের মধ্যে অন্তত একজন হবেন মহিলা।
- এলাকার দরিদ্র/ভূমিহীন বা নিম্নআয়সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে ২ জনকে গ্রুপের সদস্য করতে হবে। এদের মধ্যে একজন মহিলা হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- দুইজন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাকর্মী (কমিউনিটি ক্লিনিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারী) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন, তবে ক্লিনিকসংশ্লিষ্ট কাজে তাঁদের ভোটদানের অধিকার থাকবে না।

কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সদস্যদের একজনকে সভাপতি, একজনকে সহ-সভাপতি ও একজনকে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মনোনয়ন/নির্বাচন করবেন। সভাপতি ও সহ-সভাপতির মধ্যে একজন মহিলা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কমিউনিটি ক্লিনিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত দুইজন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর (স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারী) মধ্যে যাকে গ্রুপ সদস্যগণ যোগ্য মনে করবেন তাকে সদস্য-সচিব হিসেবে মনোনীত করবেন। কমিউনিটি গ্রুপের কার্যকালের মেয়াদ হবে গ্রুপ গঠনের তারিখ থেকে পরবর্তী দুই বছর।

কমিউনিটি ক্লিনিক সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি গ্রুপকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই দায়িত্বসমূহ পালনের মধ্য দিয়েই গ্রুপ উপলব্ধি করতে পারবে যে, এই কমিউনিটি ক্লিনিক তাদের এলাকার ৬,০০০ মানুষের সম্পত্তি এবং জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এই ক্লিনিক পরিচালিত হবে। আশা করা হচ্ছে যে, এই উপলব্ধি থেকে কমিউনিটি গ্রুপ ক্লিনিকের নিরাপত্তা বিধান, এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ তথা সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন নিশ্চিত করবে। ক্লিনিকের নিরাপত্তা বিধান অর্থাৎ ক্লিনিক ভবন, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির নিরাপত্তা বিধানকল্পে কমিউনিটি ক্লিনিকের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসরত গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে একজন আগ্রহী ও উপযুক্ত সদস্যের নেতৃত্বে একটি নিরাপত্তা উপ-কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এছাড়া নিরাপত্তা বিধানকল্পে কমিউনিটি গ্রুপ কর্তৃক একজন নৈশপ্রহরী নিয়োগ এবং কমিউনিটি গ্রুপের তহবিল থেকে এই নৈশপ্রহরীর ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কমিউনিটি গ্রুপের তত্ত্বাবধানে এলাকাবাসী স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমেও কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে পারেন। এছাড়া নিয়োগকৃত নৈশপ্রহরীকেও ক্লিনিকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করা যেতে পারে। ক্লিনিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়-নির্বাহের জন্য কমিউনিটি গ্রুপ অর্থ সংগ্রহ করে একটি তহবিল গঠন করতে পারবে।

(চলবে)

শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সঠিক পদ্ধতি

নাসরিন সুলতানা

বুকের দুধ হচ্ছে শিশুর জীবনের শ্রেষ্ঠ সূচনা। শিশুর সুস্বাস্থ্য লাভ এবং সঠিকভাবে বেড়ে উঠার জন্য বুকের দুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মায়ের স্বাস্থ্যের জন্যও বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। বুকের দুধ অনেক রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। আমাদের দেশে অধিকাংশ শিশু অপর্যাপ্ত বুকের দুধ পায় বলে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগে ভোগে এবং মৃত্যুবরণ করে। বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব, কারণ বুকের দুধ-খাওয়া শিশুর তুলনায় বুকের দুধ-না-খাওয়া শিশুদের মৃত্যুর ঝুকি দ্বিগুণ বেশি। বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে বছরে ১.৩ মিলিয়ন শিশুর জীবন বাঁচানো সম্ভব।

জন্ম থেকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ এবং তারপর পরিপূরক খাবারের পাশাপাশি ২ বছর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।

শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় মা এবং শিশুর অবস্থান এবং স্তনে-মুখে সংযোগ স্থাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিশুর পর্যাপ্ত দুধপ্রাপ্তি অনেকাংশে নির্ভর করে সঠিকভাবে বুকের দুধ খাওয়ানোর ওপর। বোটার ওপরের এরিওলা অর্থাৎ কালো অংশে দুধের নালীগুলো মোটা থাকে, যেখানে শিশু চাপ দিলে দুধ ভালো আসে কিন্তু বোটার অগ্রভাগে চাপ দিলে নালীর মাথা বন্ধ হয়ে যায় এবং দুধ বের হয় না বা খুবই কম পরিমাণে আসে। তখন শিশু ঠিকমত দুধ পায় না বলে বিরক্ত হয়ে কান্না শুরু করে। এর ফলে মায়েরও ধারণা জন্মে যে, তার বুকে দুধ কম। এতে করে মা ও শিশু দু'জনেই বুকের দুধের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে—যার ফলে আসলেই বুকের দুধ কমে যায়। তখন মা বাধ্য হয়ে আলগা দুধ খাওয়ানো শুরু করে। পরবর্তীকালে এই শিশুরা বুকের দুধ খাওয়া একেবারেই ছেড়ে দেয়। কিভাবে একজন মা সঠিকভাবে বুকের দুধ খাওয়াবেন অর্থাৎ দুধ খাওয়ানোর সময় মা এবং শিশুর অবস্থান কীরকম হবে ও স্তনে-মুখে সংযোগ স্থাপন সঠিক হবে তা নিচে দেখানো হলো:

বসে বুকের দুধ খাওয়ানোর সঠিক ভঙ্গি

শুয়ে বুকের দুধ খাওয়ানোর সঠিক ভঙ্গি

শিশু সঠিকভাবে স্তন চুষছে

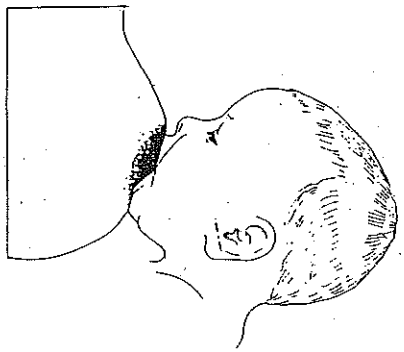

বাইরে থেকে যেরকম দেখা যায়

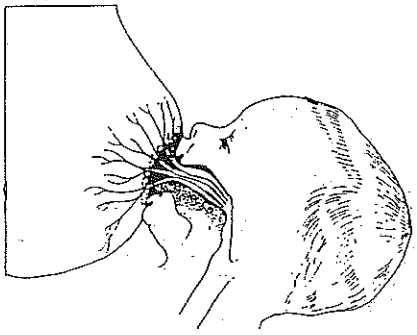

ভিতরের অবস্থা

শিশু সঠিকভাবে স্তন চুষছে না

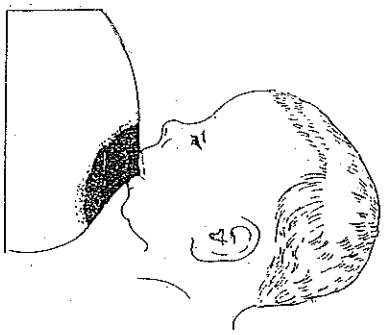

বাইরে থেকে যেরকম দেখা যায়

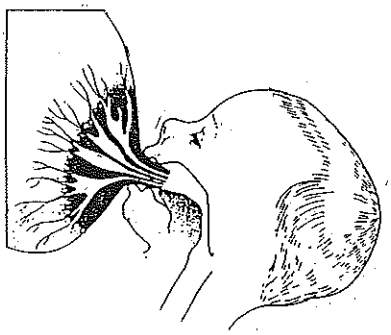

ভিতরের অবস্থা

স্বাস্থ্য কুইজ ২৮

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে পানিতে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রার পরিমাণ কত? আর্সেনিক দুষণ প্রতিরোধের তিনটি উপায় লিখুন।

২. আর্সেনিক দুষণ-কবলিত এলাকায় সরকার কোন চারটি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

৩. ডেঙ্গু জ্বরের বাহকের নাম কী এবং এই জ্বরের লক্ষণ কী কী?

৪. 'কোল্ড চেইন' (Cold chain) কী? কোন কোন ভ্যাকসিন 'ফ্রিজের কম্পার্টমেন্টে' সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক?

৫. ভিটামিন সি-এর অভাবে কী রোগ হয়? এই রোগের ছয়টি লক্ষণ কী কী?

(প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে অবশ্যই ৩০ জুন-এর আগে পৌঁছাতে হবে)

স্বাস্থ্য কুইজ ২৭-এর উত্তর

১. জন্মের সময় শিশুর ওজন ২.৫ কেজি থেকে কম হলে শিশুকে কম জন্ম-ওজন (Low-birth-weight)-এর শিশু বোঝায়।

২. একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় ১২০ দিন পর পর রক্তদান করলে তার শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না।

৩. অপুষ্টির প্রধান কারণ দু'টি : অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ ও সংক্রামক ব্যাধি।

৪. মায়ের উচ্চতা ও গর্ভপূর্ববর্তী ওজন (BMI) ১৮.৫ এর কম হলে শিশুর জন্ম-ওজনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

৫. ম্যারাসমাস/হাড্ডিসার ৬-১২ মাস বয়সের শিশুদের বেশি হয়।

(সব ক'টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেন নি)

সঠিকভাবে বুকের দুধ খাওয়ানোর নিয়ম

- ❑ মাকে আরাম করে বসতে হবে বা শু'তে হবে
- ❑ শিশুর সম্পূর্ণ শরীর মায়ের দিকে ঘনিষ্টভাবে মিশে থাকবে যেন মাথা ও শরীর একই সরলরেখায় থাকে
- ❑ শিশু যখন বড় হা করবে তখন এরিওলা অর্থাৎ কালো অংশ বেশি করে ঢুকিয়ে দিতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে যেন থুতনির নিচের দিক স্তনের সাথে লেগে থাকে এবং নিচের ঠোট উল্টা হয়ে বাইরের দিকে থাকে
- ❑ বাচ্চা ধীরে ধীরে চুষবে এবং তার গাল ভরাট দেখাবে, গেলার সময় শব্দ হবে
- ❑ শিশু চুষবে, গিলবে, থামবে অর্থাৎ একটি বৃত্ত রচনা করবে
- ❑ এক স্তনের দুধ একবার খাওয়াতে হবে। পরের বার অন্য স্তনের দুধ খাওয়াতে হবে
- ❑ দুধ খাওয়ার পর বাচ্চাকে বেশ তৃপ্ত দেখাবে এবং মা বুকে ব্যথা পাবে না
- ❑ শিশুর পেট ভরে গেলে নিজেই ছেড়ে দিবে, জোর করে ছাড়িয়ে দেওয়া যাবে না
- ❑ দুধ খাওয়ানোর পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত বোটা লম্বা দেখাবে। দুই আঙুল দিয়ে কাঁচির মতো না ধরে প্রয়োজনে তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে C-এর মতো ধরতে হবে।

যদি সঠিকভাবে ধরা না হয় তবে

- ❑ শিশুর শরীর মার থেকে দূরে থাকবে এবং মাথা ও শরীর একই সরলরেখায় থাকবে না
- ❑ শিশুর থুতনি মায়ের বুক থেকে আলাদা হয়ে থাকবে। শুধু ঠোঁট দু'টো সামনের দিকে বা বোটাতে লাগানো থাকবে
- ❑ শিশু ছোট ছোট করে টান দিয়ে চুষতে থাকবে এবং খাওয়ার সময় গাল দু'টো ভেতরের দিকে ঢুকে থাকবে
- ❑ দুধ খাওয়ার পর বোঁটা চ্যাপ্টা দেখা যাবে
- ❑ শিশু বিরক্ত হয়ে যাবে এবং দুধ খেতে চাইবে না

জেনে রাখা ভালো
ওষুধে-চুবানো মশারী

ফকির আঞ্জুমান আরা

মশার উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মশারীর ব্যবহার সবাই জানে। আমরা আগে মশা নিধন করতাম ম্যালেরিয়া থেকে পরিত্রাণ পেতে। আজকাল তার চেয়ে ভয়াবহ রোগ ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে, আর তাই আমরা মশা দেখলেই আঁতকে উঠি। পারিবারিক ও ব্যক্তিক পর্যায়ে, যেভাবেই হোক না কেনো মশারী ব্যবহারে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মশারীর ব্যবহার আরো কার্যকর করার জন্য 'ডেল্টামেথ্রিন' নামক রাসায়নিক পদার্থে মশারীকে চুবিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়।

আইসিডিডিআর,বি'র চকোরিয়া কম্যুনিটি হেল্‌থ প্রজেক্টের আওতাধীন তিনটি গ্রামে সরকারি সহায়তায় ছোট ছোট স্থানীয় সংগঠনের 'ওষুধে মশারী চুবানো' কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ক'রে এলাকাবাসীগণ বিশেষ উপকৃত হয়েছেন। পদ্ধতিটি এলাকায় বেশ জনপ্রিয়। ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া--মশা দ্বারা সংক্রামিত এই দু'টি রোগ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য 'ওষুধে মশারী চুবানোর' পদ্ধতি এ-লেখায় আলোচিত হলো:

১ লিটার ডেল্টামেথ্রিন ৩০ লিটার পানিতে মিশিয়ে একটি দ্রবণ তৈরি করলে এতে ৩০টি নাইলনের/১৪০টি সুতির/৭০টি মিশ্র সূতার তৈরি মশারী চুবানো যায়। ডেল্টামেথ্রিন কীটনাশক ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়। প্রতিটি মশারী চুবানোর আগে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে। পরিষ্কার মশারীগুলো দ্রবণের ভিতরে খুব ভালো করে চুবাতে হবে যেনো দ্রবণ মশারীর প্রতিটি অংশে ঢোকে। তারপর মশারীগুলো দ্রবণ থেকে তুলে চেপে পানি বের করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে, মশারীগুলো কেউ যেনো না নিংড়ায়। কারণ নিংড়ালে কোনো কোনো অংশ থেকে দ্রবণ একেবারেই বের হয়ে যাবে এবং মশারীর সেই অংশ মশা নিধনের কার্যকারিতা হারাবে। কেবল চেপে ধরলে অতিরিক্ত দ্রবণ চুইয়ে বের হয়ে যাবে, অথচ ওষুধের ক্রিয়া সম্পূর্ণ কার্যকর থাকবে। দ্রবণে চুবানোর পর মশারীগুলো চাটাই বা মাদুরে ছড়িয়ে ছায়াতে শুকাতে হবে। মশারীগুলো রোদে শুকানো যাবে না, কেননা দ্রবণে চুবানোর পর মশারী রোদে শুকালে বা নিংড়ালে কিংবা ঝুলিয়ে রাখলে মশা নিধনের জন্য ব্যবহৃত ওষুধের কার্যকারিতার নিশ্চয়তা থাকে না।

মশারী চুবানোর পর অতিরিক্ত দ্রবণ নদী বা পুকুরে না ফেলে একটি গর্তে বা শুকনো মাটিতে ফেলতে হবে। যে চাটাই বা মাদুর মশারী শুকানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোও নদী বা পুকুরে ধোওয়া যাবে না, কারণ এই দ্রবণ বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। এই দ্রবণ পুকুর বা নদীর পানিকে বিষাক্ত করে তুলবে এবং মাছের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

আগেই বলা হয়েছে, দ্রবণে চুবানোর আগে মশারীগুলো ভালো করে ধু'য়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। দ্রবণে চুবানোর পর আর ৬-৯ মাস এগুলো ধোওয়া যাবে না, ধু'লে ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

দিনের বেলায় মশারী ঘরের কোণে ঝুলিয়ে রাখবেন, ভাঁজ করে বাক্সে ভরে রাখবেন না। মশারী খোলা বা ঝুলানো অবস্থায় থাকলে এর সংস্পর্শে এসে মশা সংগে সংগে মরে যায়। এলাকার সবাই একই সময়ে ডেল্টামেথ্রিনমিশ্রিত দ্রবণে-চুবানো মশারী ব্যবহার করলে অল্পদিনের ভিতরেই মশার সংখ্যা কমে যাবে। ফলে এলাকাবাসী ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া রোগ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন। অবশ্য ওষুধে-চুবানো মশারী নিয়মিত ব্যবহার করা ছাড়াও মশার জন্মস্থান ধ্বংস করতে হবে। ঘরের ভিতরে এবং আঙ্গিনা ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তাহলেই এধরনের জনস্বাস্থ্য সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। ওষুধে-চুবানো মশারী ব্যবহারের মাধ্যমে মশা নিধন কার্যক্রম সফল করার জন্য প্রয়োজন সকলের সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ, আর তা সম্ভব হবে যখন প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মী নিজ নিজ এলাকায় এই পদ্ধতি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করবেন এবং এলাকাবাসীকে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবেন।

উদরাময় রোগসমূহের ওপর নবম এশীয় সম্মেলন

অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ-এর যৌথ উদ্যোগে নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে আগামী ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর উদরাময় রোগসমূহের ওপর নবম এশীয় সম্মেলন (এ্যাসকড ২০০১) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সম্মেলনের এবারের কেন্দ্রীয় বিষয় 'উদরাময় ও অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যসমস্যা নিরসনে এশীয় কার্যক্রমের নেটওয়ার্ক'।

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি), ছাড়াও অন্যান্য যেসব প্রতিষ্ঠান এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সহযোগিতা করছে, তার মধ্যে রয়েছে: ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ইন্ডিয়ান একাডেমী অফ প্যাডিয়াট্রিক্স, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা এ্যান্ড এন্টারিক ডিজিজেজ এবং ব্রেস্ট ফিডিং প্রোমোশন নেটওয়ার্ক অফ ইন্ডিয়া। আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানের জন্য যেসব বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেসব বিষয়ের ওপর বক্তব্য উপস্থাপন, গবেষণাপত্র পাঠ ও পোস্টার আকারে পরিবেশনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা চলবে এই তিন-দিনব্যাপী সম্মেলনে।

এ-সম্মেলনে যেসব বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ তাঁদের গবেষণাপত্র পরিবেশন করতে আগ্রহী, তাঁদেরকে তাঁদের গবেষণাপত্রের সার-সংক্ষেপ ড. এম কে ভান, অরগ্যানাইজিং সেক্রেটারি, এ্যাসকড ২০০১, কক্ষ নং ৩০৫৪, একাডেমিক ব্লক, ডিপার্টমেন্ট অফ প্যাডিয়াট্রিক্স, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস, আনসারী নগর, নয়াদিল্লী-এই ঠিকানায় পাঠানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। ascodd2001@delhi.as-এই ঠিকানায় ই-মেইলযোগেও গবেষণাপত্রের সার-সংক্ষেপ পাঠানো যেতে পারে।

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা : অধ্যাপক ডেভিড এ. স্যাক; প্রধান সম্পাদক: ডা: ফকির আঞ্জুমান আরা; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: এম. শামসুল ইসলাম খান; সম্পাদক: এম. এ. রহীম
সদস্য: ইউসুফ হাসান, ডা: হাজিফুর রহমান চৌধুরী, ডা: হাসান আশরাফ, ডা: সিরাজুল ইসলাম ও ডা: কামরুন নাহার; ডিজাইন: আসেম আনসারী

প্রকাশক: আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ, মহাখালী, ঢাকা ১২১২ (জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮২২৪৬৭, ৮৮১১৭৫১-৬০; ফ্যাক্স: ৮৮০২-৮৮২৩১১৬ ও ৮৮২৬০৫০; ই-মেইল: disc@icddrb.org

মুদ্রণ: সেবা প্রিন্টিং প্রেস